চলচিচত্র-সমালোচকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

মৃগাঙ্কশেখর রায়

মৃগাঙ্কশেখর রায় চলে গেলেন। বাংলা চলচিচত্রের ক্ষেত্রে সমালোচকদের মধ্যে মোটামুটি দুটি ভাগ। একদল খবরের কাগজে নিয়মিত সমালোচক অন্য দল ফিল্‌ম সোসাইটির মুখপত্রে নিয়মিত লেখেন। মৃগাঙ্কবাবু এই দুই দলের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ ছিলেন। তিনি খবরের কাগজে লিখতেন, ফিলম্ সোসাইটির কাগজেও লিখেছেন। বি. এফ. জে. এ.-তে ছিলেন, আবার ফেডারেশানেও ছিলেন। প্রদীপ্তশংকর সেন অনেকটা এই ধরনের। আসলে গোড়ার দিকে ফিল্‌ম সোসাইটি আন্দোলনের শুরুর সময়ে যাঁরা ফিল্‌ম সোসাইটি আন্দোলনে ছিলেন তাঁরা অনেকে দুপুরে কফি হাউসে আড্ডায় বসতেন, সন্ধেয় খবরের কাগজে চাকরী করতেন। কিন্তু সব মিলে তাঁদের সমালোচনা সম্পূর্ণ আলাদা হতো। মৃগাঙ্কশেখর রায় এই ধরনের সমালোচক ছিলেন।

আমরা ছবি নিয়ে লেখালেখি শু করি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে ফলে ওনার সঙ্গে পরিচয় কাগজের অফিসে। আমাদের লিটল ম্যাগাজিন দিতাম, সত্যজিৎ রায় ভিন্ন চোখে বা বভ্রন্দপ্পন্দ ঢস্তুন্ত্র ডডনক্তন্দন্তব্ধপ্সক্ত বইয়ের সুন্দর ক্তন্দ্ধনন্দভ্র করেছেন। এইভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নতুন অল্প বয়েসী হিসেবে তাঁর স্নেহ পেয়েছি। দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতেন কি করছি, কি লিখছি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ও চলচিচত্র বইয়ের ক্তন্দ্ধনন্দভ্র করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। পরে দুটো তথ্যচিত্র খন্দ্র ব্রন্ধপ্সক্তন্দভ্রস্তু ট্রন্তন্দপ্স এবং ত্মন্দক্সনক্ত ন্স ট্রপ্তন্তভ্রব্ধব্ধ-র ক্তন্দ্ধনন্দভ্র করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। রেনোয়াঁর ওপর ছবিটা ওনার বেশি ভাল লেগেছিল, অনেককে বলেও ছিলেন সে কথা। বি. এফ. জে. এ.-র অনুষ্ঠানের জন্য নির্মল ধরকে নিয়ে বার দুয়েক অফিসে এসেছিলেন অনুমতি সংক্রান্ত ব্যাপারে। সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধা মেশানো ফলে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। ওনার পরিচয় আরও বেশি করে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের ওপর ছবি করতে গিয়ে। ত্রনপ্রব্ধন্ত ক্তব্রক্তব্দ প্সন্দ্র চন্দ্বক্সব্ধপ্ত ট্রন্তন্দপ্স হলো এখন পর্যন্ত একমাত্র ছবি যেখানে বাংলা ছবির দিকপাল প্রযোজক, পরিচালক, সংগীত পরিচালকদের সজীব কথোপকথন চিত্র ধরা আছে। এই ছবি আগামীদিনে চলচিচত্র ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। বয়েসে প্রবীণ হলেও সকলের সঙ্গে মিশবার, কথাবার্তা বলার প্রবণতা তাঁর ছিল। ফলে অনেকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর সম্পাদিত ফেডারেশানের গ্রন্থ 'চলচিচত্র সমীক্ষা' তাঁর সম্পাদক চেহারার পরিচয় দেয়। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় দক্ষ এবং হাতে-কলমে ছবি তৈরির ব্যাপারটা জানা থাকায় তাঁর সমালোচনায় এসেছে তীক্ষ্ণতা। অনাবশ্যক শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক একেবারে নেই ফলে ভালো-মন্দ বিচার করতে বেশি শব্দ লাগেনি। তাঁর স্মরণে ২৪ বছর আগে লেখা 'চলচিচত্র-সমালোচকের ভূমিকা ও দায়িত্ব' লেখাটি পুনঃপ্রকাশ করলাম। --- সম্পাদক

সিনেমা নিয়ে যারা লেখেন-টেকেন, বিশেষ করে বড় বড় দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজের চলচিচ-সমালোচক যাঁরা, তাঁদের সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে কিছু উদ্ভট ধারণা আছে। অনেকেই ভাবেন যে এঁরা হলেন প্রায় সর্বশক্তিমান, এঁদের কলমের এক-এক খোচাঁয় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি ছবির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এঁদের ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্যের ফলেই বিভিন্ন চিত্রতারকার বাজারদর ওঠানামা করে। এরাঁ যেন কোন কল্পলোকের বাসিন্দা। রঙীন কক্‌টেলের লালিমা এঁদের সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত। মোরগ-মোসল্লম্ ও রেশমী কাবাবের সুরভিতে আমোদিত এঁদের শরীর, মদিরনয়না বিলোলকটাক্ষী নায়িকাদের আশ্লেষ-শিহরণে কম্পিত এঁদের সর্বাঙ্গ। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা অনেকেরই আছে। এর ফলটাও হয় গে

ালমেলে। সত্যি কথা সিনেমার একটা চটক্ সবসময়েই আছে। তার মোহে পড়ে যান অনেক সমালোচকই এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আবার সৃষ্টিশীল শিল্পী সমালোচকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও অনেক সময় অসুবিধেয় পড়তে হয়। এক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই একটা অহি-নকুল সম্পর্ক বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। ইংলন্ডের এক বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা একবার একটা অপেরা পরিচালনা করছেন। প্রথম প্রদর্শনীর রাত। খুব ঘটা করে শু হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। জাঁদরেল জাঁদরেল সব দর্শক। রাজপরিবারেরও অনেকে আছেন। স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরীও স্বস্বামী মজুত। পর্দা ওঠে। বাজনা শু হয়। অপেরার আরম্ভেই মঞ্চে একটা ঘোড়ার প্রবেশের কথা। ঘোড়া তো ঢুকল চালে। কিন্তু তার পরেই এক বিপত্তি। ঢুকেই অতসব তাবড় তাবড় অতিথি-সমাগম দেখে অশ্বরাজ তো গেল বিষম ঘাবড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই এক কেলেঙ্কারী। বিকট এক হ্রেষাধ্বনি। তারপরেই মঞ্চের ওপরে এক অপকর্ম করে পুরো স্টেজটাকেই দিল নোংরা করে। অভ্যাগতরা তো লজ্জায় নতশির। সুবেশা মহিলারা প্রায় মূর্ছা যায় আর কি! সংগীত-পরিচালক তখন বাজনা থামিয়ে নির্দেশকের ছড়িটা ঘোড়ার দিকে তাক করে বললেন, “এই যে, সমালোচক মশাই এসে গেছেন।” অনেক শিল্পীর কাছে সমালোচকের ভূমিকা এই রকমই। গিরিশ কারনাড তাঁর একটি নাটকে এক গম্ভীর, ভাবলেশহীন শিশুর ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, “বড়ো হলে এ ছেলে নিশ্চয়ই নাট্যসমালোচক হবে।” অনেকেরই হয়ত মনে আছে যে কয়েক বছর আগে ইঙ্গমার বার্গম্যান এক সমালোচককে ধরে পিটিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও বিরূপ সমালোচনার ফলে অনেক নাট্য চলচ্চিত্র পরিচালক এবং সমালোচকের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার দৃষ্টান্তও রয়েছে ভুরি ভুরি। এই রকম দোটানার মধ্যে পড়ে সমালোচকদের অবস্থা সত্যিই কাহিল হবার যোগাড়। তাই সমালোচকদের সত্যিকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে মাঝে মাঝেই নতুন করে বলা দরকার।

কবি ও সাহিত্যিকেরা অনেক সময়েই সমালোচনাকে শব-ব্যবচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করলেও একথা মানতেই হয় যে কোন সৃষ্টিশীল শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ণ রসগ্রাহী সমালোচনা ছাড়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর কনিষ্ঠতম শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র সম্পর্কে এ কথা আরও বেশি খাটে। চলচ্চিত্র একান্তভাবেই সমকালের সমবয়েসী। আজকে যে চলচ্চিত্র মহৎ জীবনবোধের শৈল্পিক রূপায়ণ বলে আখ্যাত হল, শতাব্দীর ব্যবধানে তা পরিণত হবে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির সংগ্রহে এবং আরও পরে তা শুধু শ্রুতিমাত্র। এই ক্ষণস্থায়িত্ব দুঃখের হলেও এতে অগৌরবের কিছু নেই, এবং চলচ্চিত্রের শিল্পরসোপভোগও এই অনিবার্য পরিণাম চিন্তায় ব্যাহত হয়। কারণ এই ক্ষণিক অস্তিত্বেও চলচ্চিত্রে যে ক্ষান্তিহীন রসতরঙ্গের হিল্লোল, সমস্ত শিল্পসমাহারে গঠিত এক নতুন সৃষ্টির যে আস্বাদ, তা আর খুব কম শিল্পই দাবী করতে পারে। কিন্তু অস্থায়ী বলেই চলচ্চিত্র সমকালের কাছে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে, যার স্বাক্ষর থাকে সার্থক সমালোচনার মধ্যে, এই জন্যেই আর সমস্ত শিল্পের চেয়ে চলচ্চিত্রে সমালোচনার প্রয়োজন বেশি, কারণ তার মধ্যেই বেঁচে থাকে আজকের মহান চলচ্চিত্র, উত্তরকালে যা উপকথা মাত্র।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সমালোচনার এখনও কৈশোর দশাও উত্তীর্ণ হয়নি, যদিও এদেশের সিনেমার বয়স ষাট বছরেরও বেশি। শিল্পের আর সব শাখায় সমালোচনার মান যখন বেশ উন্নত, তখন চলচ্চিত্র সমালোচনার এই দারিদ্র্য আমাদের হতবাক করে। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে অবশ্য গোড়া ধরে টান মারতে হয়। সিনেমা যখন এদেশে এলো, তখন আর সব দেশের মতোই এও ছিল লোকভোলানো ম্যাজিক। তারপর আর সব দেশের মতোই এদেশেও ব্যবসাদারেরা সিনেমার ব্যাপকতর ব্যবহার শু করল। কিন্তু বিদেশে এর পরেকার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য রকম। আস্তে আস্তে ওদেশের বিদগ্ধমহল সিনেমার বৈপ্লবিক শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হলেন । ব্যবসায়িক সিনেমার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল চলচ্চিত্রকে শিল্প প্রয়াসের অঙ্গীভুত করার প্রচেষ্টা। জন্ম নিল শিল্পসৌরমণ্ডলীর দশম গ্রহ, সমস্ত শিল্পের রস নিংড়ে নিয়ে তৈরী করা এক নতুন রসলোক। ইউরোপীয় বিদ্বৎমন্ডলীর অনেক বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অনেকেই চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই শিল্পমাধ্যমকে শক্তিশালী করে তুললেন। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক উল্টোটাই হল। চলচ্চিত্রকে বিদগ্ধ সমাজের অধিকাংশ আমলই দিলেন না। সিনেমা শিল্পসমাজের অচ্ছুৎ হিসেবে রয়ে গেল। কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক অবশ্য বণিকবৃত্তির প্রেরণায় সিনেমাহলে উঁকি মেরেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল শহুরে বাবুদের অন্ত্যজ মেয়েদের নিয়ে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করার মতো, তাই তাতে বিশেষ কাজ এগোয়নি। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মহান প্রতিভা, যুগক্রান্তির বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁর শিল্পচেতনা নিত্য নতুন মোড়ে ফিরেছে, আবিষ্কার করেছে নবতর শিল্প-আঙ্গিকের ইশারা, আম

াদের দেশের আধুনিক চিন্তাপ্রবাহের উৎস যিনি, চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন উৎসাহের প্রমাণ পাওয়া যায় না (দু-একটি চিত্রনাট্যের খসড়া, দু-একটি বিক্ষিপ্ত লেখা কিংবা প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ ছাড়া)। অবশ্য বলা যেতে পারে দেশজ চলচ্চিত্রে শিল্পবোধে উদ্দীপক প্রেরণার অভাব ছিল বলেই বুদ্ধিজীবীরা কেউ সে সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামাননি। কিন্তু যদি চলচ্চিত্রকে শিল্প বলে মেনে নেওয়া হতো তাহলে সেখানে একটা অভাববোধ থেকেই নতুন শিল্পপ্রেরণার জন্মলাভ সম্ভব হতো। তাছাড়া যখন দেখি যে মননের অন্যান্য প্রদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে আত্মস্থ করবার প্রয়াসে তৎকালীন সুধীসমাজ যত্নবান ও সিদ্ধশ্রম, তখন চলচ্চিত্রের শিল্পক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের এই নির্লিপ্তিকে শুচিবাই ছাড়া আর কি বলব? এদিকে শিক্ষিত সমাজের উন্নাসিক অবহেলার ফলে সিনেমা হয়ে উঠলো অশিক্ষিতদের প্রমোদোদ্যান। আর চলচ্চিত্র শিল্পের এই চেহারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়ে চলচ্চিত্র-সমালোচনাও বিজ্ঞাপনী প্রচারের ওপরে উঠতে পারলো না।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সমালোচনার গোড়া থেকেই যেটা প্রধান দোষ, তা হল অতিমাত্রায় সাহিত্যে নির্ভরতা! অবশ্য আমাদের দেশের সিনেমারও সব চাইতে বড় গলদ সেখানেই। এখনও যদি কোন পরিচালক বিশিষ্ট কোন সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে সার্থক চলচ্চিত্র তৈরি করেন, অধিকাংশ সমালোচকেরাই তখন উঠে -পড়ে লাগেন যে মূল সাহিত্য-উপাদান থেকে সিনেমা কতখানি বিচ্যুত হয়েছে সেটা প্রমাণ করতে। সত্যজিৎ রায়-এর মতো পরিচালককেও এ ধরনের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। এ জাতের বাগাড়ম্বর কিন্তু একেবারেই অর্থহীন। এখন সাহিত্য আর সিনেমা যে দুটো একেবারে আলাদা শিল্পশৈলী, এটা তো আজকে অজানা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের সমালোচকেরা চান যে চলচ্চিত্র যেন মূল উৎসটিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে তার একটা প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ধরনের প্রয়াসে মৌলিকত্ব নষ্ট হয়। প্রকরণ ভেদে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের প্রকারভেদ একান্তই আবশ্যিক। তাছাড়া আর একটি নিগূঢ় যুক্তি এর স্বপক্ষে আছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সাহিত্য নেহাৎই আখ্যানভাগ বা কাঠামো মাত্র। মহাকাব্য, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, পৌরাণিক কাহিনী বা লোকগাথা, সব কিছু থেকেই চলচ্চিত্রকার তাঁর উপাদান সংগ্রহ করবেন, কিন্তু চিত্রনাট্যের ঘটনা বিবর্তন ও চরিত্রের ব্যাখ্যা হবে তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গি অনুযায়ী এবং এখানে তিনি অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল হবেন না। এই যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন, এতেই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয় আর তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিমানসের রূপায়ন সার্থক হয়। এ ব্যাপারে চিত্রনির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গি যদি মূল আখ্যানের রচয়িতার সঙ্গে এক হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ হলেই প্রতিবাদের ঝড় তোলা নিতান্তই মূর্খতা। তাই "অপরাজিত" ছবিতে কেন লীলাকে আনা হয়নি, অপুর কলকাতার জীবনকে যথাযথা জায়গা দেওয়া হয়নি। কেন, "জলসাঘর"--এ ফিউডাল যুগের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়েছে। "শতরঞ্জ-কে-খিলাড়ী"র সমাপ্তিতে মূল কাহিনী অনুসরণে মীর্জা ও মীর-এর তলোয়ারবাজি দেখানো হয়নি কেন, কিংবা "ওকা উরি কথা"-য় প্রেমচন্দ্ এর গল্পের মেজাজ পাওয়া যায় না, এ জাতের অভিযোগ অবান্তর। যা দেখানো হয়নি, বুঝতে হবে যে তা পরিচালকের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলেই চিত্রনাট্যে তার জায়গা হয়নি। বরং যা দেখা গেল তার প্রকাশে চলচ্চিত্রভাষায় ব্যবহার কতটা সুষ্ঠু হয়েছে চলচ্চিত্র সমালোচনায় সেই বিচারই কাম্য। আসলে চলচ্চিত্র সাহিত্য থেকে প্রাণরস আহরণ করতে পারে তার দাসত্ব না করেও। সিনেমার ইতিহাসে এরকম উদাহরণের কিছু কম্‌তি নেই। কুরোসোয়ার "থ্রোন অফ ব্লাড" শেক্সপীয়রের "ম্যাকবেথ"-এর মতোই মহিমান্বিত, অথচ এখানে পরিচালকের সৃষ্টিশীল দর্শন মূল রচনা থেকে অনেকটাই আলাদা। দুঃখের কথা যে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আলোচনায় চলচ্চিত্রের এই মাধ্যমগত স্বাতন্ত্র্যের দিকটা প্রায়ঃশই অবহেলিত। ইদানীং অবশ্য নব্যধারার কয়েকজন সমালোচক আসছেন। যাঁদের চোখ এরকম সাহিত্যের ঠুলি আঁটা নয়, কিন্তু গড়পড়তা মোদ্দা ব্যাপারটা একই থেকে যাচ্ছে।

এই বিচারের দৈন্য অবশ্য সাধারণভাবে চলচ্চিত্র আঙ্গিক সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয়! আসলে সিনেমার আঙ্গিকসিদ্ধির আলোচনা। কিভাবে চলচ্চিত্র একটা আলাদা শিল্প হয়ে ওঠে। যে সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ সমালোচকই আশ্চর্য রকম নীরব। বিভিন্ন ক্যামেরাসংস্থান কিভাবে ছবির কাহিনীর গতি বিস্তারে সাহায্য করেছে তার বিশদ আলোচনা, চিত্রকল্পের বিশিষ্ট ব্যবহারের কোন জায়গায় বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা, ছবির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রয়োগ সার্থক হয়েছে কিনা, এ ধরনের সংবেদনশীল সমালোচনার অভাব সত্যিই পীড়াদায়ক। এখন চিত্রভাষা তো মাথার হাতুড়ি মেরে শেখানো যায় না। তার জন্য দরকার ঘনিষ্ঠ অনুশীলন। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রয়াসগুলি অনুধ

াবন করে, মনীষী চলচ্চিত্রবিদ্‌দের লেখা পড়ে, নিজের মানসিকতায় সেই শিক্ষাকে আত্মস্থ করলে তবেই রসজ্ঞ হবার অধিকার জন্মায়। অবশ্য শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। সিনেমা সম্পর্কে হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতাতেও শিল্পবোধ সমৃদ্ধতর হয়। আমরা লেখক হবার জন্য ভাষাচর্চা ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠে রাজী। শিল্পী হবার জন্য তুলি নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে পরাঙ্মুখ নই, গাইয়ে-বাজিয়ে হবার জন্য গলাসাধা কিংবা সেতারের পিড়িং-পিড়িং- এ প্রতিবেশীর কানের মাথা খেয়ে ফেলতে ব্যস্ত, এমন কি কেরানীগিরির জন্য গ্র্যাজুয়েট হবার আশায় তোতাপাখীর মতো বই মুখস্থ করতেও পিছপা নই, আর চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছুই না শিখে সবজান্তার ফতোয়া দেবো এটা তো কোন কাজের কথা নয়।

কয়েক বছর হল অবশ্য ফিল্‌ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রসারের ফলে দর্শকরুচি কিছুটা পরিণত হয়েছে এবং সমালোচনার ধারাও কিছুটা পাল্টাচ্ছে। আনন্দের কথা এই যে চলচ্চিত্র-সমালোচনায় নতুন চিন্তা যাঁরা আমদানী করছেন তাঁরা সবাই প্রায় ফিল্‌ম সোসাইটি আন্দোলনের শরীক। এঁদের প্রগতিশীল ধ্যানধারণা রক্ষণশীল সমালোচনার শেকড় ধরে নাড়া দিচ্ছে এবং এদের মধ্যে অনেকেই এখন লিটল ম্যাগাজিন কিংবা ফিল্‌ম সোসাইটি পত্র-পত্রিকার গণ্ডী ছেড়ে চলচ্চিত্র-সমালোচনার বৃহত্তর পরিধিতে চলাফেরা শু করেছেন, এটা আনন্দের কথা এবং তার ফলে বাজারী সমালোচনাতেও একটা দিক্‌-পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য এর একটা অন্যদিকও আছে। এই নতুন ধারার সমালোচকেরা অবশ্য বিভিন্ন দেশের ছবি দেখে, যথেষ্ট পড়াশুনো করে জ্ঞানার্জন করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে এঁদের বেশ বদহজম দেখা যায় এবং স্বভাবতই এঁদের আলোচনা স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে বুলি-বুক্‌নি কন্টকিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া আর একটা গোলমেলে ব্যাপার এঁদের অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এঁদের কয়েকজন আবার অন্ধ গুবাদে ঋাসী এবং প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের বিশেষ বিশেষ জনকে ঘিরে গোষ্ঠী গঠনে তৎপর এবং বিভিন্ন পরিচালকের মধ্যে কল্পিত বিরোধ সৃষ্টিতে যত্নবান। কিন্তু একটা কথা এঁরা বোঝেন না যে এই ধরনের সংঙ্কীর্ণতার ফলে প্রগতিশীল চলচ্চিত্র আন্দোলনের ক্ষতিই হয়। বিভিন্ন চলচ্চিত্রকারের মানসিকতা ও শিল্পভঙ্গি আলাদা হতেই পারে কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে একটা জায়গায় এঁরা সবাই এক। এঁরা সবাই ভাল ছবি করতে চান। তাঁদের সেই উদ্দেশ্যকে মদত না দিয়ে শুধু ঝগড়া বাধাবার মধ্যে একটা বিকৃতি নারদীয় মনোবৃত্তি কাজ করতে পারে। কিন্তু এর ফলে প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-আন্দোলনের শিবিরে ফাটল ধরবে এবং শত্রুদের হাত শক্ত হবে। যাই হোক, সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের আশা এবং এটা কল্পনা করাও দিবাস্বপ্ন হবে না যে আগামী দিনে এঁদের মধ্যে থেকেই রিচার্ড উইনিংটন কিংবা জেমস্‌ এজির মতো সৎ, চিন্তাশীল চলচ্চিত্র-সমালোচকের আবির্ভাব হবে।

এই নতুন সমালোচকগোষ্ঠীর কালাপাহাড়ী ভূমিকাও খুব গুত্বপূর্ণ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মূর্তি ভাঙার কাজটা খুবই জরী, যাতে আমরা অতীতের প্রতি অন্ধআর্কষণ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আসলে ট্র্যাডিশনের প্রতি এই যুক্তিহীন ভাবালুতা গোড়া থেকেই আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-সমালোচনাকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সত্যজিৎ রায়-এর আগে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের শিল্পশৈলীর বিশেষ কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হয়নি। যা হয়েছে তা হল গল্প-উপন্যাসের চিত্রসংস্করণ বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিত্রায়িত নাটক। ভদ্রচিসম্পন্ন পরিচালকের হাতে এই প্রয়াস খানিকটা সহনীয় হতো। কিন্তু এর বেশির ভাগই ছিল ব্যবসাদারি মুনাফাবাজি! এর মধ্যে বোম্বাই-এ শান্তারাম কিংবা পুণার ফতেলাল-দাম্‌লে ও কলকাতার নীতিন বসু, চা রায় ও মধু বসু --- তাঁদের কাজে খানিকটা আঙ্গিক পরিপাট্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়া আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সামগ্রিক ঊষরতার পটভূমিকায় তাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষ ফল দেয়নি। সাধারণভাবে আমাদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমালোচকদের তরফ থেকে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে সমকালীন মান অনুযায়ী প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু ইত্যাদিদের সৃষ্টি নিশ্চয়ই বরণীয়। ‘‘সকালীন মান’’ বলতে এখানে তারা কি বোঝান বলা মুশকিল। যদি তাঁরা সমসাময়িক দেশীয় চলচ্চিত্র-জগতের কথা বলেন, তাহলে বলা যায় যে শিল্পের রসবিচারে কোন দেশ বা আঞ্চলিক মাপকাঠি আছে কিনা সন্দেহ। আর তাঁরা যদি সমকালীন আন্তর্জাতিক সিনেমার কথা বলেন তাহলে বলব যে তখন পৃথিবীর চলচ্চিত্র-জগতে যে প্রাণস্পন্দনের সাড়া জেগেছিল, চলচ্চিত্র-আঙ্গিকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে সূচনা হয়েছিল, তা খুবই গুত্বপূর্ণ। সত্যি বলতে কি, সেই সময়কার সৃষ্টিশীলতাকে চলচ্চিত্র এখনও অতিত্রম করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশের তৎকালীন খ্যাতিমান পরিচালকদের অনেকেই বিদেশে কালহরণ করেছেন। তারপর যখন দেখি যে তাঁদের শিল্পকর্মে আন্তর্জাতিক শিল্পচেতনার বিন্দুমাত্র প্রক্ষেপণও নেই, তখন সমালোচক হিসেবে তাঁদের ক্ষমতায় আস্থাবান হওয়া যায় কি করে? তাই

সত্যজিৎ রায় যখন বলেন যে তিনি ছবির কাজ শু করবার সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য থেকে কোন সাহায্য নেন নি বা পান নি, তখনি কথাটা একেবারে খাঁটি বলে মনে হয়। আসলে সত্যজিৎ রায়-এর আগে ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেশজ সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেনি বললেই হয়। সিনেমার পর্দার ওপরকার বাস্তব আর সমাজ-বাস্তব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। চলচ্চিত্রকারেরা সবাই একটা অলীক, মায়াময় জগৎ তৈরি করে লোক ভোলাতে চাইতেন, কারণ সেই পথেই কাঞ্চনসিদ্ধি ছিল অবধারিত। নতুন ধারার চলচ্চিত্র-সমালোচনায় তাই এই ঐতিহ্য সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হওয়া দরকার এবং তার থেকেই জন্ম নেবে শিল্পচেতনাতার নতুন দিগন্ত।

কিছু সমালোচক অবশ্য আছেন, যাঁরা বলেন, “বেশ তো, সবই বোঝা গেল, ভাল ছবি চাই, ভাল সমালোচনা চাই, কিন্তু ছবি করা তো একটা ব্যবসাও বটে ! তাই দর্শকদের মন না রাখলে চলবে কেন ? তাই যেসব ছবি দর্শকরুচির দিকে চোখ রেখে তৈরী, সেগুলো সম্পর্কে একটু বাড়তি দরদ দেখালে ক্ষতি কি?” বেশ কিছু পরিচালক আবার এই মতের অংশীদার। এবং হচ্ছেন জ্ঞানপাপী, যাঁরা বুঝেশুনে নিজেদের অক্ষমতার দায় দর্শক সাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে খালাস। চলচ্চিত্র সৃষ্টি ও তার সমালোচনা গণচির হাত ধরে চলবে এ কিরকম কথা। বরং সৎ চলচ্চিত্র প্রয়াস এবং তার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা সাধারণ দর্শকচিকে পরিণত করতে সাহায্য করবে, এটাই তো বাঞ্ছনীয়। ব্যবসাকে বলি দিয়ে যাঁরা শিল্প প্রচেষ্টায় অনিচ্ছুক, সেই সব প্রযোজকদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি ব্যবসাই করতে হয় তবে তাঁরা কাটা-কাপড় বা তেজারতির ব্যবসা কন না কেন, যাতে ঝুঁকি ও পরিশ্রম অনেক কম আর লাভের সম্ভাবনাও বোধহয় বেশি। অনর্থক শিল্প ভাবুকতা এ ভণ্ডামি কেন? নাকি শিল্পাসক্তি অধুনা সামাজিক সম্মানের পাশপোর্ট। সেইজন্য? শিল্পত্বের হানি না করে যদি ব্যবসা চলে, তবে খুব ভালো। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তবে শিল্পই চাই, ব্যবসা নয়। জীবনের গভীরতম মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কোন আপোষ অসম্ভব। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-জগতের বক্স-অফিস তোষণের মনোভাব কিছু কিছু সমালোচকের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। এটা পরিতাপের বিষয়।

এবার ছবির পরিচালক ও সমালোচকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে অনেক মজার মজার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একদল পরিচালক আছেন যাঁরা বলেন, “হ্যাঁ, মশাই আপনারা তো যা মনে আসে তাই দু-কলম লিখে দেন, একটা ছবি করতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত পরিশ্রম করতে হয়, তাতো বুঝবেন না।” এই অভিযোগের উওর দেওয়া খুব সোজা । এ কথা কারো অজানা নয় যে ছবি তৈরি করতে প্রচন্ড খাটুনি দরকার। কিন্তু ছবি দেখে যদি মনে হয় যে সে পরিশ্রমের ফল শূন্য, তখন সমালোচক কি শুধুই পিঠ চাপড়াবেন? তাছাড়া আর একটা কথাও আছে। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী, যাঁরা চাল-ডাল-তেল-এ ভেজাল দিয়ে পয়সা বানাবার ফিকিরে ঘোরে, তাদেরও তো শেয়ালকাঁটা, পাথরকুচি, কাঁকর ইত্যাদি যোগাড় করবার জন্য প্রচুর মেহনত করতে হয়। তাই বলে কি তাদের আমরা বাহবা দেব? সেরকমই শিল্পে যারা ভেজালের কারবারী, তারা যত পরিশ্রমই কন না কেন, সমালোচকের সমর্থন তাঁরা আশা করেন কি ভাবে? আর একদল আছেন যাঁদে আবদারটা আবার একটু অন্য ধরনের। এঁদের কোন বক্স-অফিস-সফল-ছবি যখন সমালোচকের বিচারে নিন্দিত হয়, তখন এঁরা বলেন, “আরে মশাই, অমুক প্রডিউসার খেতে পাচ্ছিল না, অমুক ডিস্ট্রিবিউটর দেউলে হতে বসেছিল, অমুক শিল্পীর রেশন তোলবার পয়সা ছিল না, আমি তো এই ছবিটা করে এদের সবাইকে বাঁচিয়েছি। হলই বা জোলো গল্প, থাকলই বা নাকিকান্না বা রগ্‌রগে সেন্টিমেন্ট, তাই বলে ছবিটাকে একেবারে বসিয়ে দিলেন?” এর উত্তরে বলা যায় যে নিশ্চয়ই সেই পরিচালক মহানুভব। পরপোকারী এবং নানা মানবিক গুণের আধার। কিন্তু তাঁর ছবির খারাপ-ভালোর সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কোথায়? আরেক জাত আছেন তাঁরা আবার একটু বেশি চালাক। এঁরা বলেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশাই। ওসব আর্ট-ফার্ট আমরাও করতে পারি । দেখুন না, এই ছবিটা পয়সার জন্যে করেছি। এটা লেগে যাক্, তারপর দেখবেন এমন ছবি করব যে আপনাদের বুনুয়েল, ফেলেনী, গদার্দ সব হাঁ হয়ে যাবে।” কিন্তু বছরের-পর বছর ঘুরে যায়, ছবির-পর-ছবি এরাঁ করেন। টাকার ঝন্‌ঝনানি কানের কাছে বাজতে থাকে। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে চলে বাসর-মিলন। আর উপেক্ষিতা সরস্বতী প্রতীক্ষা করে ফিরে যান ব্যর্থ অভিসারিকার মতো। এরপরেও আবার অনেকে আছেন যাঁরা বলেন, “খুব তো লেখেন মশাই, একটা ছবি করেদেখিয়ে দিন তো কেমন এলেম আপনার।” এ ধরনের দাবী একান্তই অসঙ্গত। অযৌক্তিক এবং হাস্যকর। সমালোচকের কোনদায়িত্ব নেই তাঁকে ছবি করে দেখিয়ে দিতে হবে সেই শিল্পমাধ্যমে তাঁর যোগ্যতা আছে কি না।

এই যখন সাধারণভাবে আমাদের সিনেমাজগৎ ও বাজারী চলচিচত্র-সমালোচনার হাল, তখন যে গুটিকয়েক সৎ-সমালোচক আছেন, তাঁদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশের সারা বছরের চলচিচত্র-প্রয়াসের মধ্যে গুটিকয়েক ছবিই খুঁজে বার করা যেতে পারে যার উদাহরণ চলচিচত্র-সমালোচনায় উদ্ধৃতিযোগ্য। বাধ্য হয়েই তাই সমালোচককে নিজের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বিদেশী সিনেমার আঙ্গিনায় ঢুকতে হয়। কিন্তু এর ফলে স্নবারির মিথ্যা কলঙ্কে মসীলিপ্ত হবার ভয় থাকে। চলচিচত্রের তাত্ত্বিক বিচার সবসময়ে সম্ভব নয়। দেশজ শিল্প প্রচেষ্টার ধারা বিচারই অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনায় মুখ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানেও সমালোচকের হতাশা লক্ষণীয়! বছরের-পর-বছর নিষ্ফল আশায় কেটে যায়। শিল্পসিদ্ধির আশা মরীচিকা হয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগ ও ত্রুটির ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে সমালোচকেরা চিহীন হয়ে পড়েন আর তার ওপর স্বার্থসন্ধানী প্রতিযোগীরা এঁদের হেয় করবার কোন সুযোগেরই অপব্যবহার করেন না। তাই বাস্তব অবস্থার বিচারে এই ধরনের সমালোচকের টিকে থাকা খুবই কঠিন।

অবশ্য সব কথার শেষে বলা যায় যে রসোপলব্ধির অন্তিম বিচারে সমালোচনার মূল্য নিশ্চয়ই তর্কসাপেক্ষ। রসানুভুতির উৎস ব্যক্তিক রসবোধ। এই জন্যই সমস্ত সমালোচনাকেই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার যৌক্তিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শিল্পী সৃষ্টি করেন নিজের প্রাণের তাগিদে, সমালোচকের স্তুতি-নিন্দার ঊর্ধ্বে তিনি। জনচির কাছেও তিনি দায়বদ্ধ নন। সমালোচক শুধু রসস্রষ্টা ও রসভোক্তার মধ্যে মেলবন্ধনের দায়িত্ব নিতে পারেন।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com